International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 47-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

উজান-যাত্রা – শিকড়ের অভিমুখে যাত্রা

Dr. Shreeta Mukherjee
Asst. Professor of the Dept. of Bengali, Dyal Singh College, University of Delhi, India

Abstract

'Ujaan Jatra' is a novel, written by Bani Basu, a Bengali writer. She is one of the most promising writers of Bengal. She was born on 1939. She started her career, as a writer, in mid 80's. Ujaan Jatra is a novel. It talks about culture and journey. It was written on 2000. In a metro city, named Kolkata, two person, Kasturi Meheta (basically from Gujrati origin) and Kajol Singh Munda met. Coincidentally both of them are trying to search their own roots and identities. The journey is not so easy. Obstruction comes to their ways. But they are not going to stop. They want to know the truth. Kasturi wants to question her mother that why she left her home. Kajol, a tribal boy, has a hatred for his family. Because he experienced extreme poverty and illiteracy there in his childhood days. It had no contribution in his life except some bad memories. This is the way he thinks. But finally after reaching to their destination, in a tribal village, at last they will get answer. They will get peace.

বাণী বসু বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজীবনের নানা স্বাদকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গড়পরতা প্রেম-অপ্রেমের বৃত্তে পাক না খেয়ে, বিষয়ান্তরে যাওয়ার প্রয়াস তাঁর সফল হয় 'উজান যাত্রা'-র মতো উপন্যাস লেখা হলে। এ হল এমনই এক উপন্যাস যেখানে নিজেদের আত্মপরিচয়ের খোঁজে জীবনের মূল বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়তে থাকে কস্তুরী আর কাজল। গন্তব্য স্থির না করেই তারা পথ চলতে শুরু করে। লাল মাটির দেশে রোমাঞ্চকর সেই অভিযানের শেষে আদৌ তারা কোনো স্থির লক্ষ্যে পৌঁছবে কিনা, সেই প্রশ্নই পাক খেতে থাকে পাঠকের মনে।

গুর্জর কন্যা কস্তুরী মেহতা ও জনজাতিসন্তান কাজল সিং মুন্ডা 'উজান-যাত্রা' উপন্যাসে নিজস্ব সাংস্কৃতিক উৎসকে খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে যাত্রা করেছে। সুদূর গুজরাট থেকে কস্তুরী ছুটে এসেছেন বাংলার বুকে, কলকাতায়, যেখানে কেটেছিল তাঁর ছেলেবেলা, সেই শৈশব এবং শৈশবের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত মানুষগুলিকে খুঁজে পেতে। ট্রাইবাল যুবক কাজল সিং মুন্ডাও কাজের প্রয়োজনে তার আবাল্য পরিচিত গিধনি, ঝাড়গ্রাম, নিমডি-র প্রত্যন্ত প্রান্তরে সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে পৌঁছে গেছে, যেখানকার মাটিতে প্রোথিত হয়ে রয়েছে তার 'যন্ত্রণাময় শৈশব'। সামাজিক পালাবদলের এক বিশেষ সময়কালে, আদর্শবান মানুষদের পরিমণ্ডলে বসবাসের সূত্রে কলকাতা শহর সম্পর্কিত এবং বাঙালী সংস্কৃতি সংক্রান্ত এমন অনেক খুঁটিনাটি তথ্য কস্তুরী জানেন, যা আজীবন কলকাতায় থেকেও, পুরোদস্তুর বাঙালী হয়েও কাজল বা তার সহকর্মী মিঠুর জানা হয়ে ওঠেনি। ঠিক তেমনি ঝাড়গ্রাম বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কস্তুরী, মিঠু, শিখরিণীকে মোহিত করলেও সেখানকার ইতিহাস বা ভূগোল কাজলকে যেভাবে নাড়া দেয় অন্যদের সেভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। কারণ সেটা হল তার নিজস্ব ভূমি। কাজল এবং কস্তুরীর জীবনপ্রবাহ একই খাতে বয়ে চলেছে। তবে তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য এটাই যে কাজলের কাছে

বাল্যস্মৃতির অভিজ্ঞতা তিক্ত। অতীতের বেদনাবহ দিনগুলির কথা সে মনে রাখতে চায় না। অপরপক্ষে বাল্যকালে পিতামাতার সংস্পর্শে এসে শিক্ষালব্ধ দেশমাতৃকার সেবা-ত্যাগ-পরোপকার-আত্মোৎসর্গের মহান ব্রতকে আজীবন মনে লালন করেছেন কস্তুরী মেহতা। শৈশবের স্মৃতি তাঁর কাছে বড় সুখকর। সেটাই তাঁর এগিয়ে চলার পথে দিশারী স্বরূপ।

কস্তুরী মেহতার জীবন-ছক –

১) মেহতা পরিবারের উত্তরসূরী কল্যাণী মেহতার গুজরাতের গড়পরতা জীবন।
২) পঞ্চাশের দশকের কলকাতায় কস্তুরী, ওরফে কিকির বাল্যকাল অতিবাহিত করা, বঙ্গসমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি।
৩) বাংলার সাংস্কৃতিক ভাবধারা কস্তুরীর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

সবরমতীর তীরে গুজরাত নগরীতে বড় হয়ে উঠেছেন কস্তুরী মেহতা। তাঁর পিতা গুজরাতের 'কটন কিং' নরেন্দ্র মেহতার বস্ত্র-ব্যবসাকে আরো অধিক মুনাফা বা লাভের মুখ দেখাতে প্রয়োজনে রীতিমত ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রয়োগ করে থাকেন তিনি। বর্তমানে তিনিই এই ব্যবসার কর্ণধার। এই ব্যবসায়িক বুদ্ধি কস্তুরীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কারণ নরেন্দ্র মেহতারা বহু প্রজন্ম ধরে এই ব্যবসার সঙ্গেই প্রত্যক্ষত যুক্ত। প্রথমে বন্ধু শরদের সঙ্গে জোট বেঁধে নরেন্দ্র অলঙ্কারের ব্যবসা শুরু করেন, তবে সে ব্যবসায় অসাধু প্রতিযোগিতার সাথে তাল রাখতে না পেরে কন্যার পরামর্শে তিনি বস্ত্র-ব্যবসার দিকে মুখ ফেরান। মাত্র বাইশ, তেইশ বছর বয়সে পিতার ব্যবসার হাল ধরেন কস্তুরী। 'ময়দার মত ফরসা', মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারী, মধ্যবয়স্কা এই গুজরাতি মহিলার পরনে থাকে মিলের শাড়ি, যার সারা গায়ে চিকনের ফুল দেখা যায়। প্রথমে তাঁর বাস ছিল গুজরাটের শাহপুরে। সেখানকার বিরাট উঁচু ঘর, দালান, চওড়া সিঁড়ি আর ঝুল বারান্দার কথা কস্তুরীর মনে পড়ে যায় চোখ বুঁজলেই। তাঁর কৈশোরের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই বাড়ির সঙ্গে। তাছাড়া ব্যবসা শুরুর দিনগুলির কথাও মনে পড়ে যায়। শুধু ব্যবসাই নয়, গুজরাতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গেও তিনি জড়িত। বর্তমানে পঞ্চাশের ওপরে বয়স তাঁর। কর্মব্যস্ত এই মানুষটির মাথায় সবসময় ঘুরতে থাকে নানা ধরনের চিন্তা। পলিয়েস্টার-খাদির বৈচিত্র্যময়তা নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন। সবরমতী আশ্রমের উৎপাদনকে পৌঁছে দিয়েছেন সারা ভারতের বাজারে। দৃষ্টিহীন ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য গড়ে তুলেছেন সংস্থা। রয়েছে দরিদ্র মেয়েদের উপার্জনের সংস্থাও। এই সবকিছু পরিচালিত হয় তাঁর একার তত্ত্বাবধানে। পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপনে ষোলো আনা গুজরাতি কস্তুরী। তাঁর খাদ্যতালিকায় স্থান করে নিয়েছে খাকরা, কড়হি, পুরণপুরী, ধোকলা, গাঠিয়া, খমন্ড, রোটলি, ভাকড়ি, মেথিলি ভাজি, চেওড়া, জলেবি ইত্যাদি গুজরাতি খাদ্যদ্রব্য। কলকাতায় বিশেষ কর্মোপলক্ষ্যে এসে দারোয়ান রামলখনকে দিয়ে তিনি আনা করান রুটি, ভাজি, দই, পাওভাজি, অড়হর ডাল। বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে ঘরে ঢুকলে কাজলকে তিনি চা, চিনি, দুধ, তেজপাতা, গরমমশালা, আদা দিয়ে ফোটানো জলের গুজরাতি চা পরিবেশন করেন।

চেহারা-ছবিতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ষোলো আনা গুজরাতি বলে মনে হলেও কস্তুরীর দাবি অন্যরকম। প্রায়শই তিনি বলে থাকেন, "টিক, আমদাবাদও আমার শোহর – পিতৃভূমি, বাপুল্যান্ড। কলকাতাও আমারই মা-ল্যান্ড,...।"[১] অর্থাৎ ভিনদেশী, ভিন্ন সংস্কৃতির এই মহিলা কলকাতার ওপর নিজস্ব দাবি ছাড়তে চান না। 'টানযুক্ত' বাংলা বলা এই মহিলা ট্রেন থেকে নেমে প্রথম সাক্ষাতেই মিঠু এবং কাজলকে জানিয়েছেন যে ছোটবেলা কলকাতায় কাটানোর দরুন এই শহরের ওপর তাঁর একটা অধিকারবোধ রয়ে গেছে, "নিতাই বোলেনি আমার ছুটবেলা কেটেচে কলকাতায়।"[২] কস্তুরী মেহতাকে একটি বাক্য বারংবার বলতে শোনা যায়, "ছুটোবেলাই সব বেলা।"[৩] ধ্রুবপদের মত ঘুরেফিরে আসতে থাকা এই বাক্যটি পাঠককে বুঝিয়ে দেয় জীবনের প্রায় সমগ্র পরিসর গুজরাতে অতিবাহিত করার পরেও কস্তুরী শৈশবের কলকাতাকে ভুলতে পারেননি, ভুলতে চাননি। কোন এক অমোঘ আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন এই

শহরের প্রতি। এখানকার সংস্কৃতির প্রতি। স্মৃতিচারণ বা ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে, ক্রমে ক্রমে উপন্যাস কথক স্বাধীনতা সমসাময়িক বা তার কিছু পরবর্তী কলকাতার সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির চিত্রাঙ্কণ করে পাঠককে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন কস্তুরীর কলকাতা সংলগ্নতার কথা।

যৌবনের প্রারম্ভে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ শুনে সেই চল্লিশের দশকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে নরেন্দ্র মেহতা কলকাতা আসার সিদ্ধান্ত নেন। শুধুমাত্র দেশের কাজ করবেন বলে, জন্মস্থল গুজরাত, পিতৃ-পিতামহের নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আশ্রয় ও পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যু-এ তিনের এক ফার্ণ রোডের বাড়িতে ঘাঁটি গাড়েন নরেন্দ্র। বিয়ে করেন বাঙলার মেয়ে কল্যাণীকে, যে ছিল দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। ফার্ণ রোডের সেই বাড়িতে স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী কিছু মানুষের সমাবেশ ঘটতো। নরেন্দ্রর নিজের কথায়, "আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা সম্পূর্ণ নতুন দল গড়ব, যার মধ্যে এই সমন্বয় থাকবে। কী হতে পারে আমাদের কনস্টিটিউশন, আমাদের ম্যানিফেস্টো...এই নিয়েই আলোচনা হত।"[৪] এই পরিবেশে পঞ্চাশের দশকের কলকাতায় বেড়ে উঠেছে ছোট্ট কিকি, এখন যাঁর পরিচিতি কস্তুরী মেহতা নামে। বাবা-মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকা কিকি, মাত্র পাঁচ-ছয় বছর বয়সে এই আদর্শবান মানুষদের চোখ দিয়ে বাংলাকে চেনে। দেশকে জানে। এরই মধ্যে দিয়ে অবচেতনে গড়ে ওঠে তার আদর্শ ও মূল্যবোধ। ছুটির দিনে বাবার সাথে ট্রামে চড়ে কলকাতা ঘোরার সময়ে এই শহরকে আবিষ্কার করেছে ছোট্ট কিকি। সে দেখেছে টিপু সুলতানের মসজিদ, পার্কস্ট্রিটের কবরখানা, জোড়া গীর্জা, কলেজ স্কোয়ার। শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মপন্থা বিষয়ে অবগত হয়েছে। মুরলীধর বা চারুচন্দ্র চ্যাটার্জীর মত খ্যাতিবান বাঙালীর জন্ম ইতিবৃত্ত তাঁর ঠোঁটস্থ। দেশপ্রেম তাঁর হাড়ে, অস্থিতে, মজ্জায় সঞ্চারিত হয়েছে। সঞ্চারিত হয়েছে আত্মায়। ছোটবেলায় শেখা বাঙলা গান তাঁর মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। "কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো", "তোমার বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে", "হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির নাহি ভয়", "তব বজ্রানলে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে", "ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে", "বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী" ইত্যাদি দেশাত্মবোধক গান কস্তুরীর স্মৃতিতে জাগরুক হয়ে রয়েছে। ছেলেবেলায় শ্রুত এই গানগুলির মর্মার্থ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন কস্তুরী। তাঁর বাঙলার সমাজ-সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান থেকে বুঝে নেওয়া যায়, সুদূর গুজরাতে থেকেও সারা জীবন তিনি এই শহর-সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যচর্চা করেছেন। পিতা নরেন্দ্রর সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন কস্তুরী। প্রায় পঞ্চাশ বছর বঙ্গদেশের বাইরে থাকার পরেও সহযোগী নিতাইবাবুকে তিনি চিঠি লেখেন শুদ্ধ সাধু বাঙলায়। এর কারণ জীবনের প্রথম ছয় বছর কস্তুরীর বাঙলায় বসবাস। বাঙলাকে আত্মস্থ করে নিতে পারা। এবং নিয়মিত তার চর্চা করে চলা। কলকাতাবাসের দিনগুলি কখনোই তাঁর কাছে ধূসর অতীত হয়ে যায়নি। বরং তা কস্তুরী মেহতার স্মৃতিসত্তাভবিষ্যতস্বরূপ।

তাই কয়েক যুগ পরে বিশেষ উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে নস্টালজিয়াতে আক্রান্ত হন কস্তুরী মেহতা। ছেলেবেলার অনুপুঙ্খ ঘটনা তাঁর মনে পড়ে যায়। একবিংশ শতক থেকে স্মৃতির সরণী বেয়ে তিনি চলে যান বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে। ঊনচল্লিশ বছর পর এই শহরে পা দিয়েই কোন এক মন্ত্রবলে পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক কস্তুরী হয়ে গেছেন ছয় বছরের কিকি, "কেননা যতক্ষণ তিনি আমদাবাদে, সুরতে ততক্ষণ তিনি কস্তুরী বেন, কস্তুরী মেহতা। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে টাইম-মেশিন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পেছনের দিকে ছুটেছে।"[৫] উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ে এভাবেই প্রথম পুরুষে কস্তুরীর অনুভূতি-অভিব্যক্তি বর্ণিত হয়েছে। আমেদাবাদ, সুরতের কস্তুরী বেন তিনের এক ফার্ণ রোডে প্রথম রাত্রিযাপনের পর ঘুম ভেঙে উঠে পৌঁছে গেছেন ছোটবেলার দিনগুলিতে। পঞ্চাশের ভোরে জমাদারের রাস্তা সাফ করে যাওয়া, দুধওয়ালার দুধের ক্যান নিয়ে যাওয়া, কর্পোরেশনের গাড়ির রাস্তা পরিষ্কার করে যাওয়ার টুকরো টুকরো দৃশ্য ও শব্দকে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজেন কস্তুরী। তাঁর মনে পড়ে যায় সে দিনগুলির কথা যখন ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াত গন্ধরাজের গন্ধ, "গন্ধরাজের সুবাস-সায়রে এক ডুব, দুই ডুব

দিয়েই দুঃখিনী কিকি পৌঁছে যায় বাহান্ন-তিপ্পান্নর-চুয়ান্নর কলকাতায়।"[৬] নতুন সাজে সজ্জিত আজকের কলকাতাকে চিনে উঠতে না পারলেও পুরোনো শহর ও তার অলিগলিকে এই অচেনা ছবির ওপর ইমপোজ করে দিয়ে কিছুটা স্বস্তি বোধ করেছেন কস্তুরী। দক্ষিণের ক্রমবর্ধমান শহর অচেনা ঠেকলেও উত্তরের সাবেকী কলকাতার সঙ্গে তিনি অতীতের সাদা-কালো ছবির মিল খুঁজে পান। উত্তর কলকাতার কোন এক গৃহস্থ বাড়ির মুসুর ডালে কালো জিরে ফোড়নের সুগন্ধ তাঁকে মনে করিয়ে দেয় মা কল্যাণীর কথা, যিনি কিকির জন্য নিজের হাতে রাঁধতেন বহুবিধ বাঙালী রান্না। রন্ধনের সুগন্ধপ্রবাহ কস্তুরী মেহতাকে পুনরায় নস্টালজিক করে তুলেছে। পাঁচের দশকের কলকাতা ও তিনের এক ফার্ণ রোডের বাড়ি এত গভীরভাবে ছায়াবিস্তার করেছে যে স্বপ্নের মধ্যেও সেই ফেলে আসা অতীতের পরিবেশ-পরিমণ্ডলে ফিরে যান কস্তুরী। খোলা চোখে যা মনে করতে কষ্ট হয়, ঘুমের মধ্যে অবচেতনে সেসব ফেলে আসা অধ্যায়, ভুলে যাওয়া ঘটনা মূর্ততা লাভ করেছে।

তেমনই এক ধুলোমাখা অতীত অধ্যায়কে যথার্থ ভাবে জানতে, বুঝতে, তদন্ত করে দেখতে কস্তুরীর কলকাতায় আসা। গুজরাত থেকে এই শহরে ছুটে এসেছেন তিনি সংসারত্যাগিনী মা কল্যাণীর সন্ধানে, যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর শৈশব কেটেছে, আর যিনি নাকি ছিলেন তাঁর বিমাতা। দেশমাতৃকার চরণে আত্মনিবেদনে সতত প্রস্তুত কল্যাণীর প্রভাবে গঠিত হয়েছে কস্তুরীর ভাবজগত। তাঁর ভালোমন্দের ধারণা। বাঙলার কিছু বিস্মৃতপ্রায় দেশপ্রেমিক তথা বিপ্লবীর মাঝে নিজের ছেলেবেলা কাটানোর ফলে আর পাঁচজন গুজরাতি সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে কস্তুরী মেহতা আলাদা হয়ে গেছেন। একদিকে তিনি নরেন্দ্র মেহতা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। অন্যদিকে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত নীতি ও আদর্শকে জীবনে প্রয়োগ করেন। মা কল্যাণীর শিক্ষায় শিক্ষিত কস্তুরী যুক্ত হন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে। এভাবেই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তিনি বহন করে চলেছেন এক সাথে। হাওড়া স্টেশনে প্রথম দর্শনে কস্তুরীকে দেখে মিঠুর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, "ফোটোর চেয়ে অনেক কম বয়স, বেশি অ্যাট্রাকটিভ লাগে। তবে মাঝবয়সী তো নিশ্চয়ই। এবং গুজরাতি কটন কিং-এর মেয়ের নাকে-কানে হীরে নেই। আশ্চর্য!"[৭] এক্ষেত্রে গুজরাতি সংস্কৃতির ওপর বাঙালি সংস্কৃতির জয় হয়েছে। আর তাই তো গুজরাতের সাবেকী প্রথামাফিক হীরের অলঙ্কারে সুসজ্জিত হতে রুচিতে বাঁধে কস্তুরীর। এই রুচিবোধ তাঁর গড়ে উঠেছিল কলকাতায় ফার্ণ রোডের বাড়িতে কল্যাণীর কাছে থাকার সময়। দেশসেবায় নিজেকে উজার করে দিতে প্রস্তুত কল্যাণীর, স্বামীর উপহার দেওয়া বহুমূল্য অলঙ্কার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের আবছা, অস্পষ্ট ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে বলেই কস্তুরীর নিজেরও অলঙ্কারের প্রতি আসক্তি জাগেনি কোনদিন, "কিন্তু কস্তুরী কখনও হীরে ছোঁননি। তাঁর দাদির গহনা সব তোলা আছে।... নাকছাবিতে ছিল রীতিমতো ঘৃণা। এখন দেখেন, ছোট ছোট মেয়েরাও নাকছাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কানে রাজস্থানিদের মতো দুটো-তিনটে ফুটো করে হাজারও গয়না পরেছে।...দেখলে তাঁর বড় বিতৃষ্ণা হয়, কেমন একটা বিরাগ, যা কল্যাণী মেহতা মাত্র ছ'বছরের মেয়ের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন।"[৮] মা কল্যাণীর মত তিনিও সাদামাটা জীবনযাপন পছন্দ করেন। সেই জন্যই সাধারণ যাত্রীর মত রেলের দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় যাতায়াত করেন। রুটি-ভাজি-দই-এর মত সাধারণ খাবারে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। সাজপোশাকে নেই অতিরঞ্জনের ছাপ। এমনকি খ্যাতিবান, অত্যন্ত প্রভাবশালী এই ব্যক্তির সরকারী সুযোগসুবিধা গ্রহণে রয়েছে ঘোরতর আপত্তি। কল্যাণী মেহতার কন্যা বলেই হয়ত তিনি জীবনযাপনে বাহুল্য বরদাস্ত করতে পারেন না।

পঞ্চাশের বাঙলায় দেশপ্রেমিকদের সম্মিলিত বৈঠক, তাঁদের স্বাদেশিক ক্রিয়াকলাপ এবং বঙ্গনারী কল্যাণীর আদর্শবাদ কস্তুরীকে ঠিক কতখানি প্রভাবিত করেছে তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হল গুজরাতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ। ২০০২ সালে শাহপুরে দাঙ্গার সময় দরিদ্র সুন্নি, শিয়া, বোহরাদের তিনি নিজের প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আকবরনগর, কাপুরনগর, হিম্মতনগরের অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশুকে তিনি আরক্ষা দেন নিজের জীবনের পরোয়া না করে। আর রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার এই সাহস তিনি সংগ্রহ করে নিয়েছেন শৈশবের দিনগুলি থেকেই, "বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে যখন তাড়া খাওয়া

এক দঙ্গল মানুষ তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে, সেই ভুলে যাওয়া পঞ্চাশ রক্তের মধ্যে, পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠেছিল। তাঁর বাবা, কাকা, মা, মামিদের মতো নির্ভীকচিত্তে তিনি তাঁর গ্রিল, ডবল কোল্যাপসিবল সব বন্ধ করেন।"[৯] এভাবেই বারংবার নিজের মধ্যে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন কস্তুরী মেহতা। বর্তমান আর অতীত মিলেমিশে যায় মাঝে মাঝেই।

সভ্য, শিক্ষিত, শহুরে আদব-কায়দায় অভ্যস্ত কাজল সিং মুন্ডার জীবনেও জন্মলব্ধ আদিবাসী সংস্কৃতি আর বাঙালী সংস্কৃতির টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের সূচনায় প্রথম পুরুষে মিঠুর জবানীতে কাজল চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে উপন্যাস কথক পাঠককে বুঝিয়ে দিতে চান চরিত্রটির অবস্থান ও তার দ্বন্দ্বময়তার কথা। থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, চৌকো মুখ ও কষ্টিপাথরের মত চকচকে চেহারার অধিকারী কাজল সাঁওতাল পরগণার সীমাহীন দারিদ্র্যের দিনগুলিকে পেছনে ফেলে, নিজের জন্মগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে স্থান করে নিয়েছে শহরের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে। শিক্ষা ও মেধাকে সম্বল করে নিজেকে উচ্চসংস্কৃতির ধারায় মিশিয়ে দিয়েছে সে। জন্মভূমিতে ফেরার টান আর কাজল অনুভব করে না, "এখন আমি ওই সমীর কটাল, লক্ষ্মণ মাঝি, বাসন্তী মুন্ডাদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি না। দায়িত্বও বোধ করি না কি? আমার জগত উন্মুক্ত উদার, আমি সিংহবিক্রমে বিচরণ করি স্বনামে, স্ব পরিচয়ে, গর্তের ইঁদুর বার করার কাজে উৎসর্গ করার জীবন আমার নয়।"[১০] উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝে নেওয়া যায়, সচেতন অবস্থায় কাজল তার সংস্কৃতির সঙ্গে সংলগ্নতা অনুভব করে না। তবে স্বজাতি-স্বগোত্রের সঙ্গে কোন বন্ধন অনুভব না করলেও, তাকে অস্বীকার করার বাসনাও কাজলের নেই। কারণ সে জানে, "যাদের ছেড়ে এসেছে তারা তাদের মূল ছড়িয়ে রেখেছে তার দেহে, মনে।"[১১] নিজের জন্মলব্ধ পরিচয় কাজলকে হীনমন্যতাবোধে ভোগায় না। সুবেশা, সুশিক্ষিতা, উচ্চপদস্থ নারী-পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে অবলীলায় সে বলতে পারে যে সে-ই হল অনাস, অনার্য জাতির প্রতিনিধি, যারা ব্রোঞ্জ যুগ থেকে বর্তমান স্যাটেলাইট, কম্পিউটারের যুগ পর্যন্ত মানুষের উৎক্রান্তির ইতিহাস রচনা ও সাক্ষ্য বহনের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। নিজের নাম, পদবী, পরিচয় গোপন করার কথা সে স্বপ্নেও ভাবে না। বরং গর্বের সঙ্গে নিজেকে 'আদি বাঙালী' হিসাবে ঘোষণা করে। আদিবাসী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণারত কাজল শহুরে শখ-শৌখীনতা, বিলাসিতা, মোহমুগ্ধতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সততার সঙ্গে নিজের কাজটুকু কেবল করে যেতে চেয়েছে।

শৈশবের স্মৃতি কাজল সিং মুন্ডার কাছে যন্ত্রণাবহ। শৈশবকে মনে করলেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অভাব-অসুখ-অনাহারময় দিনগুলির ছবি। মা বাসন্তী মুন্ডার হাঁড়িয়া খেয়ে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ছবি। 'প্রতিদিনের আধপেটা জীবন'-এ নুনভাতই ছিল রাজভোগের মত দামী। 'উপোসী বালক'-এর ছেঁড়া জামা গায়ে, পাঁচ মাইল পথ খালি পায়ে হেঁটে লেখাপড়া শিখতে যাওয়া ও সেখান থেকে গলাধাক্কা খাওয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কাজল ভুলতে পারে না। থ্যাঁতলানো কান, কাটা ঠোঁট আর সারা শরীরে কালসিটে নিয়ে শিক্ষা ও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে চলা দিনগুলির সদা জাগরূক স্মৃতি কাজলকে আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি নৈর্ব্যক্তিক, বীতস্পৃহ করে তুলেছে। সাঁওতাল পরগনার অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, নেশাচ্ছন্নতাকে ব্যাখ্যাতীত ঘৃণা করে বলেই সেখানে সে ফিরে যেতে চায় না, -

১) "উঁহু না না, সে প্রাণপণে মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়, সেই প্রাগৈতিহাসিক ছন্ন জোছনার মদগন্ধময় রাতে সে আর ফিরবে না। কোনও মোহ, মায়া নেই তার।"[১২]

২) "সে? সে তার অতীতের প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করে। অজেয় বিতৃষ্ণা।"[১৩]

৩) "ফাদার মরিসন তাকে মাঝেমধ্যেই জিজ্ঞেস করতেন – সে তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে চায় কিনা। সে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলেছে, আমার কেউ নেই, ফাদার।"[১৪]

৪) "এখন আমি ওই সমীর কটাল, লক্ষ্মণ মাঝি, বাসন্তী মুন্ডাদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি না।"[১৫]

৫) "সে নিজেকে হাঁড়িয়া খেয়ে চুরচুর, শেষের দিকে তো দিনে রাতে সবসময়ে, সেই বাসন্তী মুন্ডার সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করতে পারত না। আজও পারে না। একটা নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি আছে।"[১৬]

৬) "আমি কিন্তু ছোটবেলায় সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছি। সে একটা দুঃস্বপ্ন, আমি হয়ত জীবনেও ভুলতে পারবো না।"[১৭]

উপরের ছয়টি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টতই বুঝে নেওয়া যায় যে কাজল তার বাল্যাবস্থা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। জ্ঞানত যে শৈশবস্মৃতি সে ভুলে থাকতে চায়, সেই সমাজ, সংস্কৃতি অবচেতনে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে স্থান করে নেয়। প্রত্যক্ষত শিকড়ের প্রতি টানকে অস্বীকার করলেও, পরোক্ষে তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে কাজল। পারে না তাকে ভুলে থাকতে। কলকাতায় শিক্ষিত, আধুনিক, সভ্য সংস্কৃতির দেওয়াল ডিঙিয়ে প্রায়শই সে উঁকি দেয় ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে লোধাপাড়ার পাশে মুন্ডা পাড়ায়। সল্টলেকের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে শাওয়ারে স্নানরত কাজলের মনে পড়ে যায় ছেলেবেলায় নগ্ন দেহে বৃষ্টিতে ভেজার দিনগুলির কথা। অধিকারী মাসিমার দেওয়া পোলাও আর ছানার ডালনা মুখে তুলতে গিয়ে তার চোখে জল এসেছে। ছোটবেলায় নিদারুণ দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতার মধ্যে বেড়ে ওঠা কাজলের মনে পড়ে যায় সেই সব খেতে না পাওয়া দুর্বিষহ দিনের কথা, যখন গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত আর আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা পেলেই মনে হত যেন সে 'রাজভোগ' খাচ্ছে।

বাসে এক সহযাত্রীর মুখে 'তুক' শব্দটি শোনা মাত্রই কাজলের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিতে এই তুক-এর গুরুত্বের কথা মনে পড়ে যায়, "তুক, তুকতাক এইসব শব্দ শুনলেই তার মনে পড়ে যায় আরও অনেক তুকের কথা। ছোট ছেলেমেয়ের কপালে ভুষো কালির টিপ। নজর লাগলে কয়লা আর ঠুঁটো ঝাঁটার কাঠি এক নিঃশ্বাসে দু'বার 'আহা' অর্থাৎ নজর লাগা লোকটির গায়ে বুলিয়ে নিজের পায়ের নীচ দিয়ে গলিয়ে বাস্তুতে ফেলে দেওয়া।"[১৮] আদিবাসী সংস্কৃতির এই কুসংস্কার বা লোকাচারকে মন থেকে সমর্থন না করলেও, সেই সংস্কৃতির অন্তর্গত হওয়ার সুবাদে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার তার মনে গাঁথা হয়ে থেকে গেছে জীবাশ্মের মত।

কস্তুরীকে লক্ষ্যহীন যাত্রাপথে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে, তাঁর সঙ্গী হয়ে সাঁওতাল পরগনায় এসে পৌঁছেছে কাজল সিং মুন্ডা। ঝাড়গ্রামের উন্মুক্ত, উদার প্রকৃতির শোভা দু চোখ ভরে দেখে কাজলের মনে হয়েছে, "কত অন্যরকম এবং কী সুন্দর আমার জন্মভূমি।"[১৯] এই মোহাবিষ্টতা ক্রমশ তাকে পেয়ে বসে। স্বভূমিকে আবিষ্কারের নেশায় সে পথ চলে। গিধনির যাত্রাপথে হঠাৎই সে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েছে। সহযাত্রীদের না জানিয়েই খোঁজ করে স্থানীয় মুন্ডাপাড়ার, যেখান থেকে বহুকাল পূর্বে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার। ছোটবেলায় মারাংবুরুর পুজোয় উৎসর্গীকৃত নিজের সাদা মোরগটির জন্য এই এত বছর বাদেও মন কেমন করে কাজলের, যে নাকি নিজের অতীতকে সচেতন প্রয়াসে ভুলে থাকতে চায়। মুন্ডাপাড়া থেকে ভেসে আসা 'সহরায়'-এর গান শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সে। মোটা দাগের শব্দে একে বলা যায় নস্টালজিয়া। এই কাজলই অথচ, উপন্যাসের অষ্টম অধ্যায়ে দাবী করেছে যে সে আবেগ-অনুভূতির তোয়াক্কা করে না, "নাঃ, তার চরিত্রে সেন্টিমেন্ট নেই। সে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় রক্ত-সম্পর্কের দিক থেকে।"[২০] অথচ দ্বাদশতম অধ্যায়ে কাজলের আচরণ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। সুতরাং একথা বলাই যায় যে এই সাঁওতাল যুবকের মধ্যে প্রথমাবধি একটা স্ববিরোধ কাজ করছে, যার বীজ উপ্ত রয়েছে তার সাংস্কৃতিক চেতনার মধ্যেই।

কস্তুরী মেহতার জীবনের গোটা সময়টাই কেটেছে গুজরাত নগরীতে। জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর প্রবল অভিমানে কলকাতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন তিনি। কারণ এই শহর আর এখানকার মানুষ তাঁর নিজের এবং পিতা নরেন্দ্রর বিশ্বাসে আঘাত হেনেছিল। বাঙলার মেয়ে কল্যাণী কোন এক অজ্ঞাত কারণে অকস্মাৎ গৃহত্যাগ করেছিলেন। সাজানো সংসার ভেঙে বেড়িয়ে যান তিনি। স্বামী-কন্যাকে দিয়ে যান অশেষ যন্ত্রণা, যে কথা তাঁরা ভুলতে পারেননি। তবু শেষপর্যন্ত কোন এক অমোঘ আকর্ষণকে এড়াতে না পেরে পঞ্চাশোর্ধ কস্তুরী কলকাতায় আসতে বাধ্য হন। মায়ের গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন তিনি। মা কল্যাণী সম্পর্কে বিশদ

তথ্য সংগ্রহ করে সন্দেহের নিরসন ঘটাতে চেয়েছেন তিনি। এটাই ছিল তাঁর কলকাতা আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কস্তুরী যেন বঙ্গসংস্কৃতিকে আরো একবার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, তার তরঙ্গে অবগাহন করতে চেয়েছেন। গোটা জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি এই শিক্ষা লাভ করেছেন যে শৈশব মানবজীবনের ভিতগঠনে বা কাঠামো নির্মাণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই গুজরাতের নিজস্ব জীবনযাপনের ধারায় সারা জীবন অতিবাহিত করার পরেও, তাঁর চারিত্রিক গঠনকার্যে কলকাতা মহানগরীর সমাজ, সংস্কৃতির অবদানকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি, -

১) "নিতাই বোলেনি আমার ছুটবেলা কেটেচে কলকাতায়। জোন্মো থেকে।"[২১]

২) "একটু গম্ভীর, অন্যমনস্ক গলায় উনি বললেন, ছুটোতে মানুষ যা শিকে আর ভুলে না। ছুটোবেলাই সব বেলা।"[২২]

৩) "টিক, আমদাবাদও আমার শোহর – পিতৃভূমি, বাপুল্যান্ড। কলকাতাও আমারই মা-ল্যান্ড, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন – আমার জোন্মো তো একানেই।"[২৩]

৪) "...তা ছাড়া তুমরা ভুলে যাচ্চো আমার ছুটবেলা কেটেচে কলকাতাতে।"[২৪]

৫) "...দিদিমণি তুমাকে কোতোবার বলতে হোবে, আমার ছুটবেলা কেটেছে কোলকাতায়। জোন্মো একানে, কোর্মো আমদাবাদে।"[২৫]

৬) "ছুটবেলাই আমাদের গোড়ে। সোব কিচুর রুটস ছুটবেলায়।"[২৬]

কাজল সিং মুন্ডার মধ্যে এই অকপট স্বীকারোক্তি প্রকাশ পায় না। অবদমিত অবস্থায় থাকে। নিজস্ব আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে তার মনে চাপা অভিমান রয়েছে। কারণ এই সংস্কৃতি তাকে দিয়েছে কেবল অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, অপমান, রিক্ততা। স্বজন-স্বভূমির প্রতি অনীহা পোষণ করা সত্ত্বেও, উচ্চতর, পরিশীলিত সংস্কৃতির সঙ্গে অবলীলায় মিশে যাওয়া সত্ত্বেও, উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় থেকেই জানানো হয়েছে যে কাজল স্ব-পরিচয়ে পরিচিত হতে চেয়েছে। সূচনায় উপন্যাস কথক কলমের কয়েকটি সূক্ষ্ম আঁচড়ে এই চরিত্রের যে গ্রাফ নির্মাণ করেন, তা থেকে বোধগম্য হয় যে, নিজের অনার্য জাতির গৌরবান্বিত ইতিহাসকে সে বীরদর্পে জাহির করে থাকে। কারণ সে জানে এই অনার্য জাতিই সভ্যতার পাদমূলে অবস্থান করছে। তারাই হাজার হাজার বছর ধরে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে বহন করে আনছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কাজল স্পষ্টতই অনুভব করে সাঁওতাল পরগনার সমাজ, সভ্যতার মূল তার মধ্যে প্রোথিত হয়ে রয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে সেই প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারায় সে আর ফিরে যাবে না। ষষ্ঠতম অধ্যায়ে কস্তুরী মেহতার সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে কাজল আরো একবার নিজ অস্তিত্ব বিষয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে নিজেকে সে 'আদি বাঙালি' বিশেষণে বিশেষিত করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে। সত্যকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। অস্বীকার করতে চেয়েছে নিজ সংস্কৃতির প্রতি চোরাটানকে। সপ্তম অধ্যায়ে কাজলের সঙ্গে আলাপিত হওয়ার পর তার মধ্যেকার সংকটকে ধরতে পেরেছেন কস্তুরী। জীবনাভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ কস্তুরী অনুভব করেন, "আদিবাসীদের নিয়েই ওর রিসার্চ। শুধু একটা পি.এইচ.ডি-র জন্য গবেষণা? না কৌতূহল? না ইতিহাসবোধ! নাকি এ ওর ব্যক্তিগত অন্বেষণ! নিজের শেকড় খুঁজছে। পরিষ্কার জানতে চায় সব। তার মানে কাজল মুন্ডা ঠিক তাঁর মতো। তিনিও তো তাঁর অতীত জানতে এতদূর এসেছেন।"[২৭] এবার কস্তুরী বুঝে গেছেন তাঁদের যাত্রাপথ একই। সে হিসেবে তাঁরা সহযাত্রী। তবে তাঁদের গন্তব্যও যে একই তা সমাপ্তিতে এসে বোঝা যায়, যখন মা কল্যাণী মেহতাকে সাঁওতাল পরগনার গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করে জীবন অতিবাহিত করতে দেখেছেন কস্তুরী। উপন্যাসের অষ্টম অধ্যায়ে এসে কাজলও এই একই সত্য উপলব্ধি করেছে যে সে আর কস্তুরী মেহতা একই পথের লক্ষ্যে হেঁটে চলেছে। নিজস্ব সংস্কৃতির খোঁজই তাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে নিজের আর কস্তুরী মেহতার অতীত অন্বেষণকে সে যথাক্রমে 'মিশন' আর 'প্যাশন' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করেছে। এভাবে নিজের ভাবনার গতিপ্রবাহের ওপর যান্ত্রিকতা আরোপ করতে চেয়েছে সে। সাঁওতাল পরগনায় যাওয়ার পর কাজলের এই বৈরাগ্যের ভাব তিরোহিত হয়েছে। সেই অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কাজলকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করেছে। নিজের

সমাজ-সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকতায় অনিচ্ছুক কাজলের মধ্যে এসময় কাজ করেছে অপরাধবোধ, "এখন আমি ওই সমীর কটাল, লক্ষ্মণ মাঝি, বাসন্তী মুন্ডাদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি না। দায়িত্বও বোধ করি না কি?...আমি যে মুন্ডা পরিচয়কে শিক্ষিত সমাজে সম্মানের যোগ্য করে তুলতে পারছি, এটাও তো অনেক।"[২৮] কাজলের এই স্বগতোক্তিমূলক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণে এই সত্যই সামনে আসে যে কাজল ক্রমশই স্বজাতির প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করছে। তার অতীতের ঘৃণাবোধ অন্তর্হিত হচ্ছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কস্তুরীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে সে বলেছে, "...তাই কলকাতাও আমার নিজের জায়গা, এই জঙ্গলমহলও আমার নিজের।"[২৯] এভাবেই উচ্চতর সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে সংযোগসূত্র আবিষ্কার করেছে কাজল সিং মুন্ডা। শহুরে পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার পরেও নিজের অস্তিত্ব বিষয়ক সচেতনতা ব্যক্ত করতে গিয়ে শিখরিণীকে কাজল জোর গলায় বলতে পেরেছে, "য়ু আর রং শিখরিণী, আই'ল রিমেন আ মুন্ডা অল মাই লাইফ। আমি কিছুর জন্যই আমার জাতি পরিচয় বিসর্জন দেব না। সে তাদের জন্য পলিটিকস বা পতিতোদ্ধার জাতীয় কিছু করি বা না করি।"[৩০] কস্তুরীর প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং জন্মভূমিতে আগমন কাজলের মনে হারানো শৈশব ও স্বভূমির প্রতি আগ্রহের জন্ম দিয়েছে।

কস্তুরী মেহতার শৈশব তাঁকে সমৃদ্ধি দান করেছিল। বঙ্গভূমির সমাজ-সংস্কৃতির দান তিনি আজীবন ভুলতে পারেননি। তবে কল্যাণীর গৃহত্যাগ কষ্ট দিয়েছিল তাঁকে। জীবনের এই একটা অঙ্ক মেলাতে না পেরে শেষ বয়সে গ্রন্থিমোচনে তিনি ছুটে এসেছেন কলকাতায়। সাঁওতাল পরগনায় একটা গোটা জাতির উন্নয়নকল্পে যুক্ত, এক নবতম আন্দোলনের পুরোধা কল্যাণীর দেখা পান তিনি। কল্যাণীর সুবিশাল কর্মযজ্ঞের সাক্ষী কস্তুরীর মনে মায়ের ভাবমূর্তি নিয়ে যে সংশয় দানা বেঁধেছিল, তা ঘুচে গেছে। সন্তুষ্ট চিত্তে দেশে ফিরতে পেরেছেন তিনি। তাঁর জীবনে বাঙালী সংস্কৃতি-গুজরাতি সংস্কৃতির মধ্যে কখনোই কোন সংঘর্ষ বাঁধেনি। যেটুকু জিজ্ঞাসা ছিল কল্যাণী সংক্রান্ত, তাঁর জীবনের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তির অবস্থান, সিদ্ধান্তগ্রহন, সততা সম্পর্কে, যা সারাজীবন কস্তুরীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সে সত্যও শেষাবধি প্রকাশ্যে এসেছে। আর তা কস্তুরীর ব্যক্তিত্বকে করেছে আরো সুগঠিত। সুতরাং দুই ভিন্ন ভূখন্ডের পৃথক ভাবধারার আত্তীকরণে ঋদ্ধ হয়েছেন কস্তুরী মেহতা। কাজল সিং মুন্ডার সমস্যাটি পৃথক। সাঁওতাল সমাজজীবন তাকে এতটাই দীন-হীন শৈশব দিয়েছে, যে তা নিয়ে গর্ব করা তো দূরের কথা, তার ওপর একটা জাতক্রোধ জন্ম নিয়েছে কাজলের মনে। স্বভূমিতে ফেরার আগ্রহ সে বোধ করেনি কখনো। আবার স্বজাতি পরিচয় অস্বীকারও করেনি। একদিকে সে স্বজাতির সঙ্গে একাত্ম বোধ করে না, অন্যদিকে অন্ত্যজ সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধানকেই সে গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছে। তার জীবনে শহরের শিক্ষিত, পরিশীলিত, শহুরে সংস্কৃতি ও গ্রামীণ আদিবাসী সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সতত ক্রিয়াশীল হয়ে রয়ে গেছে। দুহাতে বাঁধা ঠেলে তাকে এগোতে হয়েছে। সুতরাং কস্তুরী মেহতার মতো অতীত নিয়ে নস্টালজিয়া তাকে মানায় না। তবু শেষপর্যন্ত কস্তুরীর সান্নিধ্যে এসে দুই ভিন্ন সংস্কৃতি মধ্যস্থ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে কাজল। পরিমার্জিত আদিবাসী সংস্কৃতিকে খোলা মনে গ্রহন করেছে। আর তাই কস্তুরী যেমন দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারেন গুজরাত তাঁর পিতৃভূমি হলে কলকাতা অবশ্যই মাতৃভূমি, গোটা যাত্রাপথের শেষে এসে কাজলও সেভাবেই ভাবতে পেরেছে কলকাতা আর জঙ্গলমহল দুই-ই তার নিজস্ব ভূমি। 'উজান-যাত্রা' উপন্যাসে এভাবেই দুই পৃথক ব্যক্তিত্বের সহাবস্থান ঘটিয়ে কাহিনী কথক বাণী বসু দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মিলন মিশ্রনের, তথা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চিত্র অঙ্কণ করেন।

তথ্যসূত্র –

১) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৬, পৃঃ ৮৫
২) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১০
৩) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১০
৪) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১০৩
৫) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৪০

৬)বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৪২
৭) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৯
৮) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৮৮-১৮৯
৯) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৬০
১০) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৫২
১১) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৭৮
১২) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৭৭
১৩) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১০৯
১৪) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১১৩
১৫) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৫২
১৬) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৫৭-১৫৮
১৭) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৬১
১৮) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৮০-৮১
১৯) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৪৬
২০) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১১৩
২১) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১০
২২) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১০
২৩) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৮৫
২৪) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৮৭
২৫) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ৯৫
২৬) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৫০
২৭) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১০৬
২৮) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৫২
২৯) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৬১
৩০) বসু বাণী, *উজান-যাত্রা*, তদেব, পৃঃ ১৭৬